উপসংহার

মধ্যযুগের সাহিত্য প্রধানত কাব্য নির্ভর গেয় সাহিত্য। তবে লক্ষণীয় এই সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় রীতিনীতির পরিচয় মেলে। সেদিক থেকে উত্তরবঙ্গীয় কবি সাহিত্যিকেরাও যে ব্যতিক্রম নন তার পরিচয় রয়েছে তাদের রচনায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে উত্তরবঙ্গ, বিশেষত উত্তর-পূর্ববঙ্গের সাহিত্য সে ভাবে আলোচিত হয়নি। যদিও ড. সুকুমার সেন ও ড. দীনেশ চন্দ্র সেন উত্তরবঙ্গের সাহিত্যকে তাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে মধ্যযুগীয় কাব্যধারার সম্পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরতে হলে উত্তরবঙ্গের সাহিত্য ব্যতিরেখে তা সম্ভব নয়। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন - ''বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিবার বহু মালমসলাই এখনও পর্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই, তাহা এখন ছড়াইয়া রহিয়াছে বাঙলা দেশের আনাচে কানাচে।''[১] বলাবাহুল্য এই আনাচে কানাচে বলতে যে তিনি উত্তরবঙ্গের কথাই বলেছেন তা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। আমরা জানি আধুনিক যুগে বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শনের পরিচয় মেলে কামতা তথা কোচবিহারের সাহিত্য থেকে। এছাড়া কামতা-কোচবিহারের কোচ শাসনাধীন যে রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায় তার স্থায়িত্বকাল ছিল প্রায় ৪৫০ বৎসর, ইতিহাসের নিরিখে এটি একটি বিরল ঘটনা। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণের ফলে যখন সমগ্র বাংলাদেশ ভীত সন্ত্রস্ত, তখন থেকেই কামতা রাজ্যে সাহিত্য চর্চার পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। এই সময়কার কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন - কবি হেম সরস্বতী, কবি হরিহর বিপ্র এবং কবিরত্ন সরস্বতী।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে অনুবাদ সাহিত্য রচনার ধারাই ছিল উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের সাহিত্যসভার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তবে সেই অনুবাদ নিছক অনুকৃতি হয়ে ওঠেনি। তার মধ্যে একটি মৌলিকভাব ও বৈচিত্র্য রয়েছে। মূলত রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের অনুবাদ হত। তবে অনুবাদ সাহিত্যই নয়, মৌলিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কামতা-কোচবিহার রাজ্য বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। যেমন - মনকর ও

দুর্গাবরের মনসা কাব্য, পুরাণ ও মহাকাব্য অবলম্বনে বিভিন্ন আখ্যানকাব্য, লীলা-ভজন, নাট, বরগীত, ব্রতকথা, পাঁচালী, উপকথা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লোকসাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যা বাংলা লোকসাহিত্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। সর্বোপরি এই অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে আমরা উপলব্ধি করি যে মধ্যযুগের সাহিত্য হিসেবে অসমিয়া এবং বাংলা সাহিত্যের মধ্যে কামতা-কোচবিহারের সাহিত্য একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। এখনো উত্তরবঙ্গের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের পুথিশালার বহু প্রাচীন পুথিপত্র রক্ষিত আছে, যা থেকে ভবিষ্যতে আরো বহু প্রাচীন তথ্য পাওয়া যাবে।

উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি ও কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বহু নতুন নতুন তথ্যের পরিচয় পাই। মূল কাহিনিকে অভিন্ন রেখে এই সকল কবিরা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে যে সক্ষম হয়েছে তা আলোচ্য অধ্যায়টি থেকে জানা যায়। যেমন - বন্দনা অংশের মধ্যে পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গীয় কবিরা গণেশ বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেব দেবীদের বন্দনা করেছেন কিন্তু উত্তরবঙ্গীয় কবিদের মধ্যে এরকম চিত্র সাধারণত দেখা যায় না। কবি তন্ত্রবিভূতি মনসাবন্দনা দিয়ে সরাসরি কাব্য শুরু করেন। কবি মনকর ও দুর্গাবরের কাব্যে পিতামাতাকে বন্দনা এবং জগজ্জীবনের কাব্যে দেবী অম্বুজাকে বন্দনা করে কাব্য শুরু হয়েছে। সৃষ্টি পত্তন অংশেও উত্তরবঙ্গীয় কবিরা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। জগজ্জীবনের কাব্যে শিব-দুর্গা-গঙ্গার প্রণয় কাহিনি দিয়ে কাব্যের সূচনা, ধর্মের চিতা থেকে শিশুকন্যা মনসার জন্ম এবং পরবর্তীকালে পরকীয়া নায়িকা হিসেবে শিবের সঙ্গে পার্বতীর সম্পর্ক প্রভৃতি ঘটনা অভিনবত্বের পরিচয় দেয়। এছাড়া উত্তরবঙ্গীয় কাব্যগুলিতে অতিরিক্ত তন্ত্রমন্ত্রের প্রাদুর্ভাব এবং মাত্রাতিরিক্ত কামচঞ্চলতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একারণে আজও উত্তরবঙ্গে সাপে কাটলে ওঁঝার মাধ্যমে ঝাঁরফুক, তুকতাক, তাবিজ-কবজের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। জগজ্জীবনের কাব্যে শিব কামাভাবের প্রভাবে নিজ কন্যা মনসাকেও আলিঙ্গন করতে চেয়েছে এবং নিজেই ছল করে মালঞ্চ নির্মাণ করে নিজ কামনা চরিতার্থ করেছেন। শুধু তাই নয়, এই অতিরিক্ত কামচঞ্চলতার প্রভাবে বণিক খণ্ডে কবি লখিন্দরের মধ্যে দিয়ে নিজ মামী কৌশল্যাকে ধর্ষণ করিয়েছেন -

''না বলিহ ভাগিনা না বোল অনাচার।
মামীকে হরিলে পাপ হইবে তুমার।।

* * * *

টুটিল মদন-জ্বালা তুষ্ট হৈল মন।
স্নান করি ঘরে চলে বানিয়ার নন্দন।।''[২]

কাব্যের নামকরণ এবং চরিত্রের মধ্যেও বহু অভিনবত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন - মনকর ও দুর্গাবরের কাব্যে মনসাকে পোঞা এবং বেহুলাকে বেহুলি বলা হয়েছে, তাই তাঁদের কাব্যের নাম হয়েছে সম্ভবত 'পোঞা বেহুলি মঙ্গল'। জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের কাব্যের নাম হয়েছে 'পদ্মপুরাণ'। তাঁর কাব্যে বেহুলাকে বেলালি, মায়ের নাম মেনকা, বাবার নাম সদাগর এবং ভাইয়ের নাম রাখা হয়েছে শঙ্খধর নামে। এছাড়া তাঁর কাব্যে 'উষাহরণ' নামে একটি স্বতন্ত্র পালার উল্লেখ রয়েছে। সর্বোপরি এই অধ্যায়ের মধ্যে উত্তরবঙ্গের সমকালীন সামাজিক রীতিনীতি, আচার-বিশ্বাস-সংস্কার এবং স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষার বহু শব্দ ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া আজও উত্তরবঙ্গের জন সমাজে দেবী মনসাকে কেন্দ্র করে পদ্মা, বিষহরি, মাড়াইচণ্ডী প্রভৃতি দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আর এই পূজাকে কেন্দ্র করে পালা হিসেবে ব্যবহৃত হয় উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যোপাখ্যান।

তৃতীয় অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি ও কাব্য সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে তিনজনের নাম এবং কাব্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা হলেন মালদহের কবি মানিক দত্ত, যাঁর কাব্যের নাম 'চণ্ডীমঙ্গল'। এছাড়া কোচবিহারের কবি দ্বিজমাধব শর্মার 'চণ্ডিকার ব্রতকথা' এবং রংপুরের কবি দ্বিজ কমললোচনের 'চণ্ডিকা বিজয়'। এই তিনজন কবি ভৌগোলিক গত দিক থেকে উত্তরবঙ্গের তিনটি পৃথক স্থানে জন্মানোর ফলে তাঁদের কাব্যও হয়ে উঠেছে তিন রকমের। একজনের কাব্যে সঙ্গে আর একজনের কাব্যের কোনো মিল নেই।

প্রথমত, মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখা যায় তাঁর কাব্যের খণ্ড সংখ্যা হল তিন, অপরদিকে চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর অভয়ামঙ্গল কাব্যের খণ্ড সংখ্যা দুটি। মুকুন্দ চক্রবর্তী কবি মানিক দত্তকে চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি হিসেবে সম্মান জানিয়েছেন। কবি মানিক দত্তের সৃষ্টি খণ্ডের মধ্যে ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দেবীর মাহাত্ম্য এবং পূজা প্রচারের জন্য তিনি খোঁড়া, কানা এবং বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের নির্বাচন করতেন।

অনেকে বলেন, তিনি নাকি নিজেই কানা এবং খোঁড়া ছিলেন। দেবীর কৃপায় আরোগ্য লাভ করেন -

''পদ্বা বোলে শুন মা সর্ব্বমঙ্গল ।
মানিক দত্ত কানা খোড়া ফুলফুল্যানগর ।
তাকে স্বপ্ন দেখাহ সর্ব্বমঙ্গল ।
তোমার গীত গান করুক পৃথিবী ।।''[৩]

তাঁর কাব্যের অপর একটি বিশেষত্ব হল ধর্মকেতু এবং স্বর্ণকেতুর উপর দেবী ছলনার প্রভাব। তারা যেন দেবীর স্বীকার হয়েছেন। এছাড়া কবি যে উত্তরবঙ্গের মালদহ অঞ্চলের বাসিন্দা, তাই তাঁর কাব্যে মালদহ অঞ্চলের মানুষ, সমাজ, পরিবেশ, রীতিনীতি-আচার-সংস্কার ইত্যাদির প্রভাব যে পড়বে সেটাই স্বাভাবিক। পাশাপাশি গৌড়ের বিভিন্ন নদনদী, ছ্যাতা-ভ্যাতার বিল, মোড় গ্রাম, বড়গাছা, আগলা, কাঞ্চন নগর ও সন্ন্যাসী পাটন প্রভৃতি গ্রামীণ স্থান নামের সঙ্গে প্রাচীন গৌড়ের ইতিহাস জানা যায়। ভাষার ক্ষেত্রে স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব রয়েছে এবং প্রচুর আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় গ্রন্থ হল রংপুরের কবি দ্বিজ কমললোচনের 'চণ্ডিকা বিজয়'। কাব্যটিতে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যের কথা থাকলেও পৃথক কোনো খণ্ড বা বিভাজন নেই। এখানে দেবী চণ্ডী কর্তৃক স্বর্গপুরের বিভিন্ন সুরাসুরকে বধ দেখানো হয়েছে, বাস্তব মর্ত্যভূমির কোনো পরিচয় নেই। স্বর্গের রাজা সুরোথের রাজ্য রক্ষা এবং প্রজাদের সুখ-স্বচ্ছন্দের জন্য দেবী সর্বদা এগিয়ে এসেছেন। এছাড়া কাব্যটিতে অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছে রাজা সুরথোপাখ্যান দিয়ে এবং শেষ হয়েছে রাজার সার্বিক কল্যাণের মধ্যে দিয়ে। কাব্যটি মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বনে রচিত হয়েছে বলে মনে হয়। কবির বাসস্থান রংপুর হওয়ায় স্বাভাবিক কারণে কাব্যের মধ্যে রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা-শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে।

কোচবিহারের মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে রচিত হয় 'চণ্ডিকার ব্রতকথা' নামে একখানি প্রাচীন পুথি (পুথি নং-২৯)। পুথিটির রচয়িতা হলেন মাধবচন্দ্র শর্মা। কবির বাসস্থান ছিল বর্তমানে কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রাম গোবড়াছাড়ায়।

কাব্যটিতে ব্রতকথার নামোল্লেখ থাকলেও মূলত দেবী চণ্ডীর জয়গান করা হয়েছে। এখানে কোনো খণ্ড বা বিভাজন নেই। কাব্যটি কোনো দেব দেবীর নির্দেশে রচিত হয়নি; স্বয়ং রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের নির্দেশে রচিত হয়েছে এবং কাব্যটির বন্দনা অংশে শুধুমাত্র চণ্ডী দেবীর বন্দনা রয়েছে। কাব্যটি আকারে খুবই সংক্ষিপ্ত। কাব্যের ভাষায় কোচবিহার অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা-শব্দের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

তবে এখনো উত্তরবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে চণ্ডী দেবীর পূজা হয়ে থাকে। সেখানে অবশ্য চণ্ডী দেবীকে 'মঙ্গলচণ্ডী' নামে পূজা করা হয়। এই দেবীর মূর্তিতে দশটি হাতের পরিবর্তে আটটি হাত থাকে।

'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যের মধ্যে দিয়ে জানা যায় এই সাহিত্য শুধুমাত্র বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বাংলার বাইরেও এই সাহিত্যকে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। গানের মধ্যে প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা মানিকচন্দ্র, রাজা গোপীচন্দ্র, রাণী ময়নামতী, গুরু হাড়ি পা প্রভৃতি চরিত্রগুলি সেই পরিচয় বহন করে। আজও বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলের নীলফামারীতে রাণী ময়নামতীর গড়, গোপীচন্দ্র রাজার রাজপ্রাসাদ, ময়নামতী যাদুঘর, হরিশ্চন্দ্র রাজার পাট, রাণী অদুনা-পদুনার নামে দীঘি প্রভৃতির বাস্তব রূপ পরিলক্ষিত হয়। এই কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে ত্রিপুরার লাইমাই-ময়নামতী পাহাড়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস 'রাজমালা' গ্রন্থে এর পরিচয় রয়েছে। এখানে গোপীচন্দ্রের পরিবর্তে গুপীচন্দ্রের মাতার নাম রয়েছে ময়নাবতী এবং তাঁর কন্যার নাম ছিল লাইমাই। এই লালমাই ময়নাবতী পাহাড়ের রাজা ছিলেন গুপীচন্দ্র। এছাড়া নাথ সাহিত্যের এই কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে বাংলার বাইরের নাথ, যুগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। অসমের কামরূপ, শিলচর, বরাক, নওগাঁ, হাইলাকান্দি, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটী প্রভৃতি অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের লোক বাস করে বলে জানা যায়। পাশাপাশি একাধিক জায়গায় গোরক্ষনাথের মঠ মন্দির এবং নাথ যোগীদের বিভিন্ন শৈব মন্দিরের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় শুধুমাত্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, অসম, ত্রিপুরা নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও নেপাল সহ একাধিক রাষ্ট্রে নাথযোগী পন্থীদের উপস্থিতি ছিল।

নাথযোগীদের ধর্মকেন্দ্রিক সাধন-ভজনের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের যোগসূত্র ছিল বলে কাব্যটি থেকে জানা যায়। ময়নামতী ও হাড়িপার শক্তি সেকালের মন্ত্রশক্তির মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একই সঙ্গে কাব্যটির মধ্যে দিয়ে সমকালীন রংপুর অঞ্চলের সমাজ জীবনের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পুত্র, শাশুড়ি-বউ এমনকি বারাঙ্গনারা সমাজে কী ধরণের জীবন যাপন পালন করতেন তা আলোচ্য কাব্যটির মধ্যে দিয়ে জানা যায়। সর্বোপরি কাব্যটি যেহেতু রংপুর অঞ্চলের কৃষকদের মুখ থেকে সরাসরি লিখে নেওয়া হয়েছে, সেকারণেই কাব্যটিতে স্থানীয় আঞ্চলিক রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষার প্রভাব পড়েছে, যা কাব্যটিকে একটি স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে।

'গোসানীমঙ্গল' কাব্যটি আধুনিককালে রচিত হলেও কাব্যটির বিষয়বস্তু নেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ মধ্যযুগ থেকে। কাব্যটি রচিত হয় কোচবিহারের রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে। কাব্যটির রচয়িতা রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর বাসস্থান ছিল রংপুরের ঘোড়াঘাট অঞ্চলের বানদ্বার গ্রামে। উত্তরবঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানতে হলে গ্রন্থটির পরিচয় জানা আবশ্যিক। একথা ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যও স্বীকার করেছেন। কাব্যটির মধ্যে এমন কিছু ঐতিহাসিক তথ্য বা উপাদান রয়েছে যা এখনো পুরোপুরি উঠে আসেনি। মনে করা হয় কবি রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী ঐতিহাসিক উপাদানের সঙ্গে প্রচলিত সামাজিক কিংবদন্তী এবং মিথের সমন্বয়ে 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেন। কাব্যটিতে কামতা রাজ্যের 'খেন' রাজবংশের উল্লেখ রয়েছে। দেবী গোসানীকে কেন্দ্র করে যে কাব্যটি রচিত হয়েছে, সেই দেবীর মন্দির আজও রয়েছে কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমারে গোসানীমারী গ্রামাঞ্চলে। শুধু তাই নয়, প্রাচীনকালের আরও বহু ঐতিহাসিক উপাদানের চিত্র আজও প্রত্যক্ষ করা যায়। রাজা কান্তেশ্বরের গড়, রাজপাট, কূয়ো, মন্দির, লঙ্গরখানা, নহবৎখানা, সিঙ্গিমারী নদী, কাজিলী কুড়া দীঘি, কোদাল ধোয়া দীঘি, জামবাড়ী, রাজবাড়ির প্রাচীন দেওয়াল (বাগ্ দুয়ার, যম দুয়ার ইত্যাদি ফলক) প্রভৃতির বাস্তব পরিচয় রয়েছে। ইতিহাসের উল্লেখ থেকে আরও জানা যায় কামতারাজ নীলাম্বর মৎস্যদেশ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করতো এবং তাঁর রাজধানী কামতাপুরের চারিদিকে সুন্দর সুন্দর রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছিলেন, তার কিছু কিছু পরিচয় আজও পাওয়া যায়। যেমন - কোচবিহার-কাঁকিনা রোড, দিনহাটা-মেখলীগঞ্জ রোড, রংপুরের নীলাম্বরী সড়ক, রংপুর ও ঘোড়াঘাটের বহু দুর্গ প্রভৃতি

উল্লেখযোগ্য। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক ড. বুকানন হ্যামিলটন সাহেব রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের আমলে গোসানীমারী অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং এখানকার ঐতিহাসিক সত্যতাকে স্বীকার করে নেন। অতি সাম্প্রতিককালে ভারত সরকার ১৯৯৮-২০০০ খ্রিস্টাব্দে আর্কিওলজিকাল সার্ভে আব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে প্রথম এই অঞ্চলের খনন কার্য শুরু করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েক বছর পরে সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। নিম্নে মানচিত্রের সাহায্যে ঐতিহাসিক উপাদানের বিষয়গুলিকে স্পষ্ট করা হল -

কোচবিহার জেলা

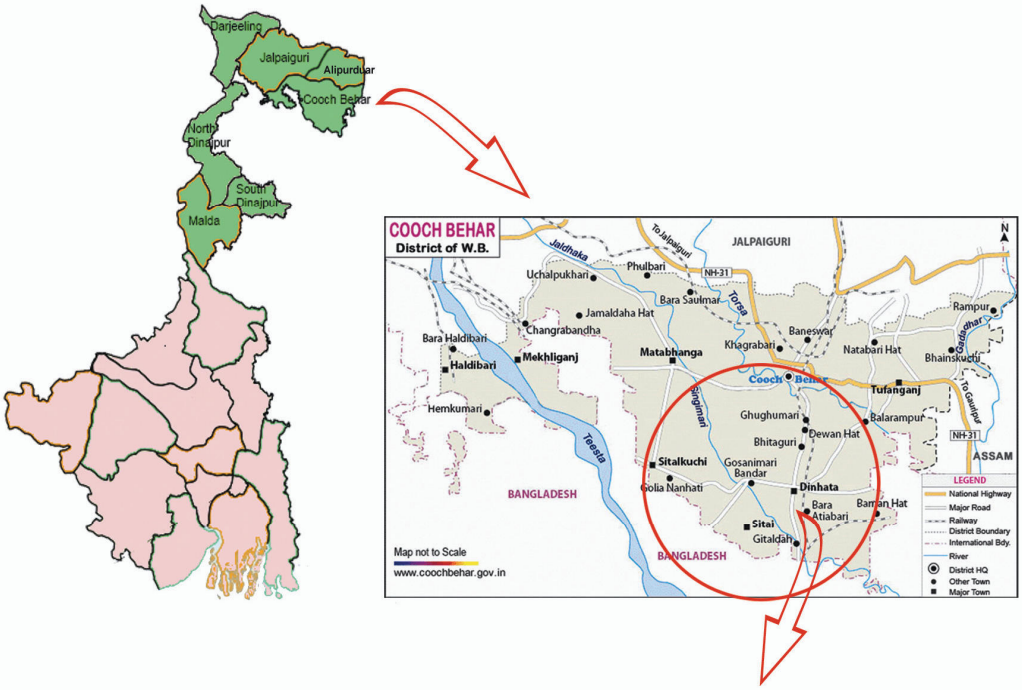
Darjeeling
Jalpaiguri
Alipurduar
Cooch Behar
North Dinajpur
South Dinajpur
Malda
COOCH BEHAR
District of W.B.
JALPAIGURI
Jaldhaka
To Jalpaiguri
Phulbari
Uchalpukhari
NH-31
Bara Saulmar
Torsa
Jamaldaha Hat
Changrabandha
Bara Haldibari
Haldibari
Mekhliganj
Matabhanga
Khagrabari
Baneswar
Natabari Hat
Rampur
Gadadhar
Bhainskuchi
Cooch Behar
Tufanganj
To Gaurhar
Hemkumari
Singimari
Ghughumari
Balarampur
Dewan Hat
Bhitaguri
NH-31
ASSAM
Teesta
Sitalkuchi
Gosanimari Bandar
Golia Nanhati
Dinhata
Bara Attabari
Baman Hat
Sitai
Gitaldah
BANGLADESH
BANGLADESH
Map not to Scale
www.coochbehar.gov.in
LEGEND
National Highway
Major Road
Railway
District Boundary
International Bdy.
River
District HQ
Other Town
Major Town
N

মাথাভাঙ্গা
কোচবিহার
তুফানগঞ্জ
পিঞ্জারির ঝাড়
সিঙ্গিমারী নদী
কাঁকিনা রোড
কাজলিকুড়া
জামবাড়ি
তিস্তা
গোসানীমারী রাজপাট
শীতলখুচী
গোসানীমারী বাজার
গোসানীমারী স্কুল
জয়দুয়ার
দিনহাটা
ভোলানাথের দীঘি
কোদাল ধোয়া দীঘি
গোসানীমারী গড়
সন্ন্যাসী দুয়ার
সিতাই
রংপুর রোড
বাংলাদেশ
সিঙ্গিমারী নদী
বাংলাদেশ
পেটলা বাজার
বাঘদুয়ার
শিলদুয়ার
গোসানীমারী মন্দির

গ্রন্থপঞ্জি

১। কোচবিহার দর্পণ, নবম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৫৩, পৃ - ১৭৭ ।

২। ভট্টাচার্য, সুরেশচন্দ্র; দাস আশুতোষ সম্পাদিত : কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ - ১৬৫-১৬৭ ।

৩। ওঝা, সুনীলকুমার : মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭, পৃ - ৩৩।